বাংলা নববর্ষ ও আমাদের সংস্কৃতি (পর্ব-১)

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

মুহম্মদ মতিউর রহমান

নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ বিভিন্ন দেশে প্রাচীনকাল থেকে চালু আছে। এর মধ্যে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত। নববর্ষ অর্থ বছরের প্রথম দিন বুঝায়। ঐদিন বিভিন্ন উৎসব-আনন্দের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়া হয়। এ উৎসব-আনন্দের ধরণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। এর মাধ্যমেই বিশেষ দেশ, জাতি বা জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সন-তারিখ চালু আছে। প্রত্যেক সন বছরের ঠিক একই দিনে শুরু হয় না। তাই বিভিন্ন সনের প্রথম দিন বা নববর্ষও সারা বিশ্বে একই দিনে পালিত হয় না। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সন অনুযায়ী সারা বিশ্বে বিভিন্ন দিনে নববর্ষ উদযাপিত হয়।

ইংরেজগণ তথা বিশ্বব্যাপী খ্রীস্টান সম্প্রদায় ইংরাজি নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুয়ারি নববর্ষ হিসাবে করে। ৩১ ডিসেম্বরের রাত বারোটার পর থেকে তাদের নববর্ষ শুরু হয়। ইয়াহুদীদের নিকট নববর্ষ রাশহাস্না নামে পরিচিত। প্রাচীন পারস্য তথা বর্তমান ইরান সাত দিনব্যাপী নওরোজ উৎসব পালনের মাধ্যমে নববর্ষ করে। তাদের নবর্ষের প্রথম দিন শুরু হয় ২১ মার্চ তারিখে। হিজরী সন শুরু হয় আরবি মাসের ১ মহররমে। বাংলা নববর্ষ শুরু হয় ১ বৈশাখে। এভাবে বিভিন্ন সন বছরের বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়। ফলে তা উদযাপিতও হয় বিভিন্ন দিনে।

প্রত্যেক দেশ বা জাতিই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান ও দেশীয় প্রথানুযায়ী নববর্ষ করে থাকে। প্রত্যেকের নববর্ষ উদযাপনের রীতি-নীতি লক্ষ্য করলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, গোড়ার দিকে ধর্মীয় বিধি-বিধানই নববর্ষ উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কালক্রমে তার সাথে দেশীয় রীতি-প্রথার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বর্তমানে একমাত্র হিজরী নববর্ষ ব্যতীত অন্য সকল নববর্ষ উদযাপনে দেশীয় রীতি-নীতি, প্রথা ও সংস্কৃতির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ ধর্মের বহিরাবরণে সাধারণ মানবিক আচার-আচরণ, প্রথা, সংস্কার ও সংস্কৃতিই এখন ক্রমান্বয়ে নববর্ষ উদযাপনের প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।

একমাত্র হিজরী নববর্ষ এর ব্যতিক্রম। হিজরী নববর্ষ উদযাপনে দেশীয় বা আঞ্চলিক রীতি-নীতি প্রথার কোন প্রভাব নেই। শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রেরণা থেকেই বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ আবেগ-অনুভূতির সাথে এ দিনটি পালন করে থাকে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে তাদের নববর্ষের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে থাকে হিজরী নববর্ষ উদযাপনের পদ্ধতি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিজরী নববর্ষ উদযাপনে তেমন কোন জৌলুসপূর্ণ অনুষ্ঠান করার রেওয়াজ নেই। বড়জোর, ঐদিন ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হিজরী সনের উৎপত্তি তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হয়। কেউ কেউ দোয়া-দরূদ পড়ে, মিলাদ শরীফ পড়ে, নফল রোযা রেখে, নফল নামায পড়েও দিনটি উদযাপন করে থাকে। বাহ্যিক কোন অনুষ্ঠান বা আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বে ঐদিনে কেউ কখনো করে না। হিজরী সনের বিভিন্ন মাস ও তারিখ অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মুসলমানেরা বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। সেদিক থেকে হিজরী সনের একটি আন্তর্জাতিক রূপ রয়েছে। হিজরী নববর্ষ উদযাপনের মধ্যেও এক ধরনের ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের পরিচয় পরিস্ফূট হয়ে ওঠে।

মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে সরকারী সন ছিল হিজরী। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় কাজে হিজরী সনকে মান্য করা হয়। মুঘল আমলে সরকারী সন হিজরী হলেও তারা ইরানি ঐতিহ্য অনুযায়ী নওরোজ উৎসব পালন করতো। মুঘল

সম্রাট হুমায়ন সর্বপ্রথম এ উৎসবের প্রচলন করেন। এরপর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিশেষ জাঁকজমকের সাথে নওরোজ উৎসব প্রতিপালিত হয়। মুঘল সম্রাট আকবর খাজনাদি আদায় ও অন্যান্য রাজকর্ম সম্পাদনের সুবিধার জন্য নতুন সন তথা বাংলা সন প্রবর্তন করলেও তারা ১ মহররম বা ১ বৈশাখ এ কোনটাতেই নববর্ষ পালন করতেন না। পরবর্তীতে সম্রাট আকবর যেমন বাংলা সন প্রবর্তন করেন, তেমনি তাঁর প্রবর্তিত নতুন ধর্ম ‘দীনে-এলাহি’র স্বারক হিসাবে ‘এলাহি সন’ নামেও একটি নতুন সন প্রবর্তন করেন। এলাহি সনের প্রথম দিনে তিনি ‘নওরোজ’ উৎসব পালনেরও ব্যবস্থা করেন। নওরোজ উৎসব ছিল সম্পূর্ণ পারস্যের রীতি অনুযায়ী। এতে ইসলাম-পূর্ব পারসিক রীতি-রেওয়াজ অনুসৃত হতো, ইসলামী ভাবধারার কোন প্রতিফলন এতে পরিলক্ষিত হতো না। আকবর-প্রবর্তিত বাংলা সন বাংলায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব লাভ করলেও তাঁর প্রবর্তিত ‘দ্বীনে-এলাহি’ যেমন কেউ গ্রহণ করেনি, তেমনি দ্বীনে এলাহী সনও তাঁর সাম্রাজ্যের কোথাও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। ফলে তা স্থায়ী হয় নি।

> প্রায় অর্ধ সহস্র বছর পূর্বে বাংলা সনের উৎপত্তি ঘটলেও বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ উদযাপনের কোন প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে বহুজাতির বাস। প্রাচীন যুগ থেকে এখানে শক-হুন-দ্রাবিড়, আর্য-অনার্য, জৈন-বৌদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বসবাস। এখানে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠীই কখনো বাংলা নববর্ষ উদযাপন করেছে বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলের শুরু থেকে এখানে বাঙালি মুসলমানরা ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে হিজরী নববর্ষ পালন করে এসেছে। সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা সন প্রবর্তিত হলেও বাঙালি মুসলমানগণ কখনো বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ উদযাপন করেছেন বলে জানা যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ মুসলমান। তাদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষ অনুযায়ী পালিত হয় না। ইসলামের সকল উৎসব-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় বিধি-বিধান হিজরী সনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে হিসাবে এটা আন্তর্জাতিক ও বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য এক ও অভিন্ন। পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ সম্পূর্ণ অভিনব ও সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবনা।

হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণের রেওয়াজ থাকলেও পয়লা বৈশাখে নির্দিষ্ট কোন পার্বণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। তাদের চৈত্র-সংক্রান্তির অনুষ্ঠান মূলত চৈত্রের শেষ দিনে উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলা অবশ্য চৈত্র মাস অতিক্রম করে অনেক সময় বৈশাখ মাসের কয়েক দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু তাই বলে তা কখনো নববর্ষের উৎসব হিসাবে গণ্য হয় না, চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা বা উৎসব হিসাবেই তা সকলের নিকট পরিচিত। তাছাড়া, চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে যে সব অনুষ্ঠানাদি সংঘটিত হয়, তা অনেকটা নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক। ঐদিন একজন মানুষের বুকে-পিঠে বা জিহ্বায় বর্শি বিদ্ধ করে কাঠের সাথে বেঁধে চড়কির মতো ঘুরিয়ে এক ধরনের পৈশাচিক আনন্দ করা হয়। এ ধরনের নির্দয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন আনন্দানুভূতির প্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়। অতএব, নববর্ষের উৎসব হিসেবে তা গণ্য হবার আদৌ উপযুক্ত নয়।

বৌদ্ধদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও ১লা বৈশাখে উদ্যাপিত হয় না। ‘বৈশাখী পূর্ণিমা’ নামে তাদের যে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান তা বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার রাতেই উদযাপিত হয়ে থাকে। ঐদিন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু দিন হিসাবে এটা সারা বিশ্বে বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র দিন। তাই তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপন করে থাকে। কিন্তু ১লা বৈশাখ বা নববর্ষ হিসেবে তাদেরও কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান নেই। একসময় বৌদ্ধ পাল যুগে বাংলাদেশে যখন বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির একাধিপত্য ছিল, তখনো ১লা বৈশাখে তারা কখনো নববর্ষের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বলে জানা যায় না।

পার্বত্য উপজাতীদের একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের নাম ‘বৈসাবি উৎসব’। চৈত্রের শেষ দিন থেকে বৈশাখের প্রথম দু’দিন মোট তিন দিন ধরে তারা এ উৎসব প্রতিপালন করে। সাধারণত কুমারী মেয়েরা এ অনুষ্ঠানে অবিবাহিত তরুণদের সাথে মিলে এটা উদযাপন করে। এটা মূলত পানি উৎসব অর্থাৎ পরস্পরের গায়ে পানি ছিটিয়ে তারা আনন্দ-ফূর্তিতে মত্ত হয়। অতএব, এটাও বৈশাখের প্রথম দিন উদযাপিত হয়, তা বলা যায় না।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ক্ষেত্রে মাত্র দুটি অনুষ্ঠানের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। একটি ‘হালখাতা’ ও অন্যটি ‘পূণ্যাহ’। সাধারণত জমিদারগণের বকেয়া খাজনাদি আদায়ের জন্য আগেকার দিনে মহাধূমধামের সাথে ‘পূণ্যাহে’র আয়োজন করা হতো। এখনো বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে পূণ্যাহ উদযাপনের রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। এটা মূলত খাজনা আদায় এবং প্রজাদের নিকট থেকে নজর-নেয়াজ আদায়ের উদ্দেশ্যে উপজাতীয় রাজাদের বাড়িতে এ উৎসব পালিত হয়। এটা রাজার প্রতি প্রজা সাধারণের

আনুগত্য প্রদর্শনেরও এক সুবর্ণ মুহূর্ত। হালখাতার আয়োজন বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ব্যবসায়ী- মহাজন, সুদে টাকা লগ্নীকারী, সোনা-রূপা বন্ধককারীগণ বকেয়া পাওনা ও সুদের টাকা উসূল করার জন্য হালখাতার আয়োজন করা হয়। রাজস্ব-বর্ষের শেষ মাস হিসাবে সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে পূণ্যাহ এবং বর্ষ শুরুর মাস হিসাবে বৈশাখের প্রথমার্ধে হালখাতা পালিত হয়। ফসলাদির অবস্থা ও প্রজাসাধারণের আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করে এ দুটি অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষণ ঠিক করা হয়। হালখাতার আয়োজন তো সারা বৈশাখ মাস ধরেই চলে এবং এখনো এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখের সাথে এ দুটি অনুষ্ঠানের তেমন কোন সম্পর্ক-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সনে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। ফলে পূণ্যাহের অনুষ্ঠানও অনেকটা অবান্তর হয়ে পড়ে। তবু পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন উপজাতির মধ্যে সামাজিক রীতি ও রাজার প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শনের রেওয়াজ হিসাবে তা এখনো প্রচলিত আছে। হালখাতার রেওয়াজ বাতিল হয় নি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি ব্যবসায়ীগণ দীর্ঘকাল থেকে হালখাতার আয়োজন করে আসছে। হাল অর্থ চলতি, খাতা অর্থ হিসাব বা হিসাবের খাতা। দুটোই ফারসি শব্দ, একত্রে এ দুটি শব্দের অর্থ হলো নতুন হিসাব বা পুরাতন বছরের দেনা-পাওনার হিসাব চুকিয়ে নতুন হিসাবের খাতা খোলা।

> পুরনো বছরের বকেয়া আদায় করে নতুন বছরের শুরুতে নতুন হিসাবের খাতা খোলার পদ্ধতি হিসাবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের জন্য হালখাতা একটি পুরনো রেওয়াজ। কিন্তু তাই বলে এটাকে নববর্ষের অনুষ্ঠান বলা যায় না। এটা একটি মহাজনী পদ্ধতি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে এর যতটা সম্পর্ক, বাঙালি সংস্কৃতির সাথে ততটা নয়, বাংলা নববর্ষের সাথে তো নয়ই। কারণ অনিবার্যভাবে এ অনুষ্ঠান কখনো বৈশাখের প্রথম দিন উদযাপিত হয় না, আগে যেমন এখনো তেমনি বৈশাখের শুরুর দিকে অথবা বৈশাখ মাসের যে কোন দিন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া, এ অনুষ্ঠান কেবল স্বল্পসংখ্যক ব্যবসায়ী-মহাজন ও টাকা লগ্নীকারীদের, তাদের বকেয়া টাকা উসূল বা লগ্নীকৃত টাকার সূদ আদায়ের উপলক্ষ হিসাবে এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র শ্রেণীর খদ্দের তাদের গাঁইটের পয়সা দিয়ে মহাজনের পাওনা শোধ করার বা উচ্চহারে সূদের টাকা পরিশোধ করার জন্য যে অনুষ্ঠানে যোগদান করে সেটাকে সর্বজনীন আনন্দোৎসব বলা যায় না। এ অনুষ্ঠান সকলে মিলে কোন একটি নির্দিষ্ট দিনেও পালন করে না। যার যার সুবিধামত দিন-ক্ষণ অনুযায়ী এর আয়োজন করে থাকে। সে কারণেও এটাকে সর্বজনীন বলা যায় না। তাছাড়া, হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের হালখাতা, বৌদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা ও পার্বত্য অঞ্চলে পূণ্যাহ পালনের পদ্ধতিও ভিন্ন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও পার্বত্য উপজাতীয়গণ তাদের ভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ফলে এতে কোন একক বাঙালি সংস্কৃতি নয়, বরং বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলিম, বাঙালি বৌদ্ধ ও পার্বত্য উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে থাকে।

বৈশাখ মাসে উদযাপিত আর একটি অনুষ্ঠানের নাম নবান্ন। নতুন ফসল ঘরে তোলার পর যে অনুষ্ঠান করা হয় সেটাই নবান্ন অনুষ্ঠান। কিন্তু এটা পালনেরও কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই। তাছাড়া, শুধু বৈশাখ মাসেই নয়, পৌষ মাসেও আমন ধান কাটাকে উপলক্ষ্য করে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। বলাবাহুল্য, এ অনুষ্ঠানটিও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় চিরকাল ভিন্ন রীতি-পদ্ধতিতে তাদের স্ব স্ব ধর্মীও প্রথা অনুযায়ী উদযাপন করে আসছে।

আগের দিনে ঘটা করে নবান্নের অনুষ্ঠান হতো। সাধারণত হিন্দু সমাজ এ অনুষ্ঠান পালনে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতো। মুসলিম সমাজে এটা এতটা ব্যাপকতা পায়নি। এটা অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার মৌসুমে একবার এবং বৈশাখে আউস ধান কাটার মৌসুমে আরেকবার অনুষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। উভয়েই তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ফলে এর মাধ্যমে উভয়ের ভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিন্দুরা নতুন ধান-দুর্বা, আম-জাম-কলা-লিচু ইত্যাদি ফল এবং মৌসুমী নানা ফুল দিয়ে প্রসাদ তৈরি করে মাটির তৈরি মূর্তি তথা তাদের কাল্পনিক দেব-দেবীর পাদমূলে অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করে, মন্দিরের পুরোহিত নানারূপ মন্ত্রোচ্চারণ করে, পূজা-অর্চণা শেষে নিবেদিত নৈবেদ্যের সদ্ব্যবহার করে। তাদের ভক্ত-অনুরক্তরা ও মন্দিরগামীরাও প্রসাদ পেয়ে পরমার্থ লাভের আনন্দে খুশী হয়। আগেকার দিনে এসব অনুষ্ঠানে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনার ব্যবস্থা থাকতো। মন্দিরের ঠাকুর-পুরোহিত, পূজারী ও দেবানুগ্রহ-প্রত্যাশীদের জন্য এটা ছিল রীতিমত আনন্দোৎসব। হিন্দুদের মধ্যে এখনো নবান্নের উৎসব পালিত হয়, কিন্তু আগের দিনের সেই আড়ম্বর এখন আর চোখে পড়ে না।

অন্যদিকে, নবান্ন উপলক্ষে মুসলমানগণ মোল্লা-মুনশী-মুরব্বী ও প্রতিবেশীদের জিয়াফত করে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। নতুন ধানের তৈরি ভাত, পিঠা, মোয়া-মুড়কি-নাড়□, আম, কলা, জাম ইত্যাদি নানা রকম ফল, গাইয়ের দুধ ইত্যাদি পরিবেশন করে সংসারের আয়-বরকত, সকলের কল্যাণ ও পরলোকগত ব্যক্তিদের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে। মসজিদে শিরণী, পায়েশ, খিচুরী ইত্যাদি পাঠায়, মুসল্লীগণ ও গরীব-মিসকিনরা তা খেয়ে দোয়া করে। কখনো আত্মীয়-স্বজনকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এনে খাওয়ায়, কখনো তাদের বাড়িতে নতুন ফসলে তৈরি পিঠা, মুড়ি, মুড়কি, নাড়□, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি পরব হিসাবে পাঠায়। এ রকম বিভিন্ন উৎসব-আনন্দে মুসলমান বাঙালিরা বছরের প্রথম মাসটি অর্থাৎ বৈশাখ মাস (অনিবার্যভাবে ১লা বৈশাখ নয়) উদযাপন করে থাকে। তবে মুসলমানদের অনুষ্ঠানে কখনো নাচ-গান, বাদ্য-বাজনার আয়োজন হয় না। আগের দিনে যেভাবে উৎসব-আনন্দ হতো, এখন বাঙালির টানা-পোড়নের সংসারে তার মাত্রা কমে গেলেও গ্রাম বাংলায় এখনও তার কিছুটা প্রচলন রয়েছে।

বাংলা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখে পূর্ব থেকে কোন উৎসব-অনুষ্ঠান চালু না থাকলেও বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখে বহু পূর্ব থেকে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান চালু রয়েছে। বস্তুত বাংলা সন চালু হবার বহু পূর্বেই ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতু বা মাসে বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান চালু আছে। বৈশাখ মাসে নতুন ফসল ঘরে তুলে কৃষকরা যেমন সরকারী রাজস্ব আদায় করে, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়ী ও দোকানীরা হালখাতার আয়োজন করে ভোক্তাদের নিকট থেকে তাদের পাওনা আদায় করে থাকে। হালখাতা উপলক্ষে ব্যবসায়ী-টাকা লগ্নীকারী ও মহাজনগণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, চিড়া-মুড়ি, দই-মিষ্টির দ্বারা তারা স্ব স্ব গ্রাহক-খদ্দের-শুভানুধ্যায়ীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। হালখাতা অনুষ্ঠানটি ব্যবসায়ীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জন্য বাকি-বকেয়া উসূলের এটি একটি সুবর্ণ মুহূর্ত। হিন্দু মহাজনগণ যারা আগের দিনে উচ্চ সূদে গরীব কৃষক-জনসাধারণকে টাকা ধার দিত, সোনা-রূপার গহনা, থালা-ঘটি-বাটি ইত্যাদি বন্ধক রাখতো তারাও এ সময় বিগত এক বছরের সূদের টাকা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিত। এমন একটা সময় ছিল যখন সুদূর আফগানিস্তান থেকে লম্বা লাঠি হাতে, লম্বা পাগড়ি পরা কাবুলিওয়ালারা এসেও বাংলার গরীব কৃষকদের টাকা ধার দিত, নতুন বছরে ফসল কাটার সময় তারাও এসে সূদের টাকা উসূল করে নিত। তাই বৈশাখ মাস যেমন ফসলের মাস, প্রাপ্তির মাস, আবার তেমনি দেনা-পাওনা পরিশোধের মাস হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

বৈশাখ মাসে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হতো। মেলায় কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্য-বিভিন্ন জাতীয় ফল, ফসলাদি, তাঁতীর তৈরি কাপড়-চোপড়, কামার-কুমারের বিভিন্ন তৈজষ-পত্র, কাঠ মিস্ত্রির তৈরি কাঠের আসবাবপত্র, স্বর্ণকারদের সোনা-রূপার গহনা, নানা জাতীয় মিষ্টি, তরি- তরকারি, বাঁশ-বেতের তৈরি নানা জাতীয় আসবাবপত্র, খেলনা ইত্যাদি অসংখ্য পণ্যদ্রব্য মেলায় আমদানি করা হয়। এটা বাঙালি সাধারণ মানুষের জন্য একদিকে যেমন অর্থকরী ফায়দা নিয়ে আসে, অন্যদিকে তেমনি নানারূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী এক সঙ্গে পাওয়ার আনন্দে সকলে মেলায় আসে। ছেলে-মেয়েদের জন্য এটা এক আনন্দের উৎসব। তাই বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত এসব মেলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। অবশ্য এসব মেলা যে বৈশাখের ১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় তা নয়। আবার বৈশাখ মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও গ্রাম-বাংলা বিভিন্ন ধরনের উৎসব-আনন্দ ও মেলার আয়োজন করা হয়।

বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে এ মাসে একটা নবতর আবেগ অনুভূতি লাভের অবকাশ যেমন আছে তেমনি বৈশাখের অন্য একটি রূপও আমাদের নিকট অতি পরিচিত। অনেক সময় খরা, অনাবৃষ্টি অথবা অকাল বন্যা আমাদের একান্ত প্রত্যাশার ফসল বিনষ্ট করে ঘরে ঘরে বিষাদের কালো ছায়া বিস্তার করে। এছাড়া, কাল বৈশাখীর তান্ডবলীলার কথা তো সকলেরই জানা। অনেক সময় বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হয়ে গ্রাম-বাংলার সুখের সুনিবিড় ছায়াঘেরা ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। সে সাথে স্বপ্নভঙ্গ হয় সাধারণ অল্পবিত্ত অগণিত মানুষের। তখন বৈশাখ আনন্দ-উৎসবের মাস না হয়ে বিষাদের বেদনাঘন অনন্ত দুঃখের মাসে পরিণত হয়। এভাবে বৈশাখ শুধু যে □ফসলী মাস□ হিসাবে বাঙালির নিকট আনন্দের মাস তা নয়, কখনো □কাল-বৈশাখী□র রূপে তা ভয়াবহরূপেও ধরা দেয়।

বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নিজ নিজ ধর্মীয় নিয়ম-নীতি ও প্রথানুযায়ী বৈশাখ মাসটি উদ্যাপন করলেও ১লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন সম্পর্কে কারোই কোন সচেতনতা ছিল না। আগেকার দিনে ১লা বৈশাখে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো না। বৈশাখ মাস ফসল কাটার মাস। তাই এ মাসে কৃষক-কৃষাণীগণ অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটায়। অনেকে খাবার সময় পর্যন্ত পায় না, অনুষ্ঠান করার কথা ভাববার সময় কোথায়? অনেক সময় বৈশাখের নতুন পানির ঢল অকস্মাৎ কৃষকের পাকা অথবা আধা পাকা ফসল ডুবিয়ে দেয়। তখন সারাদিন এমন কি রাতের বেলায়ও ডুবন্ত ফসল কেটে ঘরে তোলার কাজে কৃষককে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই আনন্দ-ফূর্তি বা অনুষ্ঠান করার মতো মনের অবস্থা তখন কারোই থাকে না। তবে ঠিক মত ফসল ঘরে তোলার পর কৃষাণ-কৃষাণির মনে যে অনাবিল

আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, তার কোন তুলনা নেই।

অবশ্য হালখাতার অনুষ্ঠান অনেকে ১লা বৈশাখে করে, আবার অনেকে বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এমনকি বৈশাখ মাসের যে কোন দিন করে থাকে। এখনো ঠিক সেভাবেই চলে আসছে। হালখাতা অনুষ্ঠানের দিন হিসাবে ১লা বৈশাখ কখনো নির্দিষ্ট ছিল না। তাই বলা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতিসমূহ বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে বা নতুন বছরের প্রথম দিনে নববর্ষ উদযাপন করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে কখনও বছরের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে অথবা নববর্ষের প্রথম দিনে বর্ষবরণ করার রীতি চালু নেই। মূলত পুরো বৈশাখ মাসটাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সকলে স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী উদযাপন করে আসছে।

পাঁজি-পুঁথি, দিন-ক্ষণের হিসাব অনুযায়ী যতটা নয়; তারচেয়ে মওসুম হিসাবে বাঙালির নিকট এসব উৎসব-আনন্দের কদর সর্বদা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য জাতি বিশেষত ইংরাজগণ যেমন বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বছরের অন্যান্য দিন তারা কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্থ, বাঙালিরা সেদিক থেকে অন্যরকম। তারা স্বভাবগতভাবে সারা বৎসরই অল্প-বিস্তর কিছু একটা আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকতে পছন্দ করে। এ কারণেই বাঙালি হিন্দু সমাজে বার মাসে তের পার্বণের রেওয়াজ চালু হয়েছে। এটা হলো এমন কিছু প্রথা বা সংস্কার যা দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এতে ষড় ঋতুর একটি প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে এটা তাদের ধর্ম বা সংস্কৃতির অংগে পরিণত হয়েছে। তাই বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি প্রধানত ঋতু-বিবর্তনের সাথে বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট। ষড়ঋতুভিত্তিক তাদের বিভিন্ন উৎসব-আনন্দ, আচার-অনুষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য যুক্ত হয়ে কালক্রমে তা ধর্মীয় গুরুত্ব লাভ করেছে। সে দিক থেকে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি বহুলাংশে লোকজ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

প্রকৃতপক্ষে, আবহমান কাল থেকে বাঙালি মুসলমানদের যেমন নিজস্ব উৎসব-আনন্দ রয়েছে, বাঙালি হিন্দু ও বৌদ্ধদেরও তেমনি নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে। কিন্তু মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালির কোন একক সর্বজনীন উৎসব-আনন্দ অনুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট দিন এদেশে কখনো ছিল না। কারণ প্রত্যেকটি আনন্দ-উৎসবই প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী করতো। অতএব, ভিন্নতা থাকবেই। তবে এ ভিন্নতা কখনো কোনরূপ বিরোধ বা সংঘর্ষের জন্ম দেয়নি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই নির্বিবাদে ও শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে।

দ্বিতীয় পর্বঃ বাংলা নববর্ষ ও আমাদের সংস্কৃতি (পর্ব-২)

মুহম্মদ মতিউর রহমান

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এর জন্ম ৩ পৌষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সিদ্বেশ্বরী কলেজ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর রয়েছে বৈচিত্রময় ভূমিকা। তিনি ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য কথা (১৯৯০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২), মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪), মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় ফররুখ একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।